পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

# আহমদী

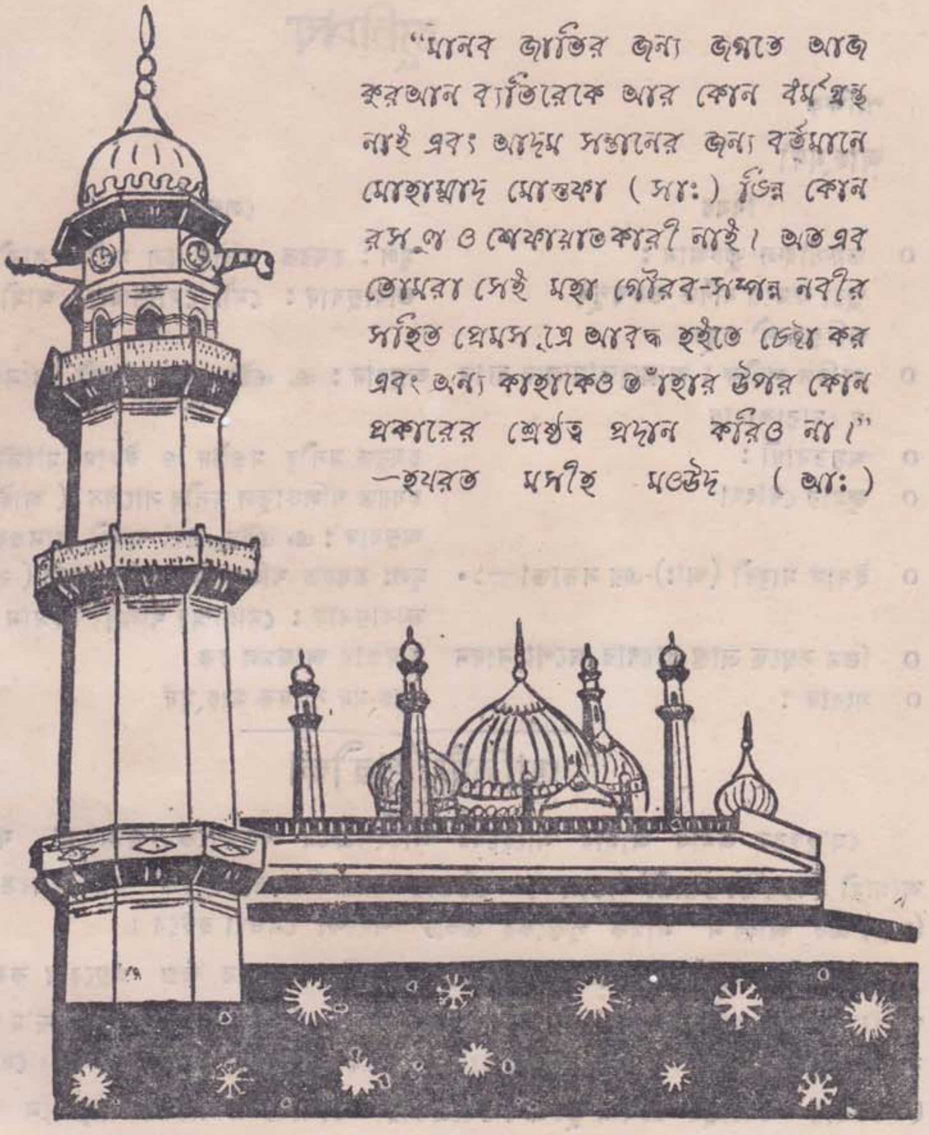

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যাতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার
নব পর্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ১৮ তম সংখ্যা

১৫ই মাঘ ১৩৮৩ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৭ ইং : ১১ই সফর ১৩৯৭ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩০শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৮ তম সংখ্যা

| | বিষয় | লেখক | পৃঃ |
|---|---|---|---|
| o | তফসীরুল-কুরআন :<br>সুরা ফজরে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ | মুল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)<br>ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃআঃ আঃ | ১ |
| o | হাদিস শরীফ : আল্লাহ্‌তায়ালার ধ্যান ও মোরাকাবাহ | অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ৫ |
| o | অমৃতবাণী : | হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী ( আঃ ) | ৭ |
| o | জুমার খোৎবা | হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস ( আইঃ )<br>অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ৯ |
| o | ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা--১০ | মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী ( রাঃ )<br>ভাবানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান | ১৫ |
| o | জিন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অপোনোদন | খন্দকার আজমল হক | ১৯ |
| o | সংবাদ : | আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ | |

## তালিমী পরীক্ষা

মো'হ্‌তরম জনাব আমীর সাহেবের আদেশক্রমে বন্ধুগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকাল ১০ ঘটিকার সময় "তবলীগে হক" বা "হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আহ্বা'ন" নামক পুস্তকের একটি পরীক্ষা নেওয়া হইবে।

জ'মা'তের সকল বন্ধুকে এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। আতফাল ও আনসার ভাইগণ বই দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। খোদ্দা'ম ভাইগণের জন্য বই দেখিয়া লেখার কোন অনুমতি থাকিবে না। এই কার্যক্রমের কামিয়াবীর জন্য দোয়া করিবেন। ( খাকছার-- ওবাইদুর রহমান ভুইঞা, সেক্রেটারী তালীম, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আ'হ্‌মদীয়া। )

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লার সদর দপ্তর হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে যে সকল লাজনার প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী যেন নিজ নিজ স্থানীয় লাজনা ইমাউল্লার' সদস্যাগণের মধ্যেযাহারা 'অছিয়তের' চাঁদা দিতেছেন তাহাদের নাম ও 'ওছিয়ত' নম্বর সহ তালিকা কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। (খাকছার—মাকসুদা রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লা।)

وعلى عبده المسيح الموعود　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　بسم الله الرحمن الرحيم

পাক্ষিক

# আহমদী

নব পর্য্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ১৮ তম সংখ্যা

১৫ই মাঘ, ১৩৮৩ বাং : ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৭ ইং : ৩১শে সুলহ ১৩৫৬ হিজরী শামসী

তফসীরুল কুরআন—

## প্রভাত ঐ অদূরে !

## পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বানী

### জ্ঞানীগণের জন্য সবক

### ইসলামের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

### আলো, অঁাধার এবং পূনঃ আলোকের যুগের আবর্তন

*(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে 'সূরা ফজ্‌রের' তফসীর অবলম্বনে লিখিত)* ।—মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫)

### পূনঃ এক ও দুইয়ের তত্ব

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনে ইহার প্রকাশ সওরের গুহায় প্রকাশিত হয়, যখন তাঁহার ও ইসলামের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছান্ন। সওরের গুহায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান ও রক্ষাকারী খোদা ছিলেন। তিনি দুশমনগণের মোকাবেলায় তাঁহাদেরকে সরল ও সহজ অথচ অচিন্তনীয় ভাবে উদ্ধার করিয়া লয়েন। তের শতাব্দীর শেষভাগে সারা দুনিয়া জুড়িয়া মুসলমানগণ ইসলামের আমলকে ছাড়িয়া রুহানীভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে সহায়হীন ও একা করিয়া দিয়াছিল। ঠিক এমনি সময়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), তাঁহার অকৃত্রিম খাদেম হিসাবে রুহানীভাবে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দঁাড়াইলেন। এবারও তাঁহাদের দুইজনের উপর সেই এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্ব-শক্তিমান ও রক্ষাকারী খোদা তাঁহার ছায়া বিস্তার করিয়া দিলেন। তবে এই বারের গুহা সওরে না হইয়া রুহানী ভাবে হিন্দুস্থানে হইয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপর ইলহাম হইয়াছিল :

رسول صلے اللہ علیہ وسلم پناہ گزیں ہوئے قلعۂ ہند میں

অর্থাৎ, "রসুল সাল্লাল্লাহো আলায়হে অসাল্লাম আশ্রয় গ্রহণ করিলেন হিন্দুস্থানের কেল্লায়।" এতদ্বারা ইহাই বলা হইয়াছে যে, বর্তমান যুগে ইসলামের একান্ত সংকটাপন্ন অবস্থায়, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর রূহ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সহিত হিন্দুস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, যেভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে সওর গুহায় হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্য কেল্লা-স্বরূপ হইয়াছিল, তেমনি বর্তমান যুগে আল্লাহতায়ালার আশ্রয় হিন্দুস্থানকেও রুহানীভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জন্য কেল্লা-স্বরূপ করিবেন। বস্তুতঃ ইসলাম বলিতে পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে একমাত্র এই উপমহাদেশেই রহিয়াছে এবং এখান হইতেই ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের প্রোগ্রাম পরিচালিত ও সাফল্য মণ্ডিত হইতেছে।

ইহা ছাড়া হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) দেখিতে দুই নবী মনে হইলেও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ফানাফির রসুল হওয়ায় রুহানীভাবে দুই জন বস্তুতঃ এক। উভয়েরই খোদা এক, কলেমা এক, পুস্তক ও শরীয়ত এক এবং উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। প্রভেদ এই যে একজন প্রভু ও অপর জন পরম ও আত্মবিলীন খাদেম। হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন,

وہ ہے میں چیز کیا ہوں - بس فیصلہ یہی ہے -

"তিনি বিরাজমান। আমি কিছুই না। বাস, মীমাংসা ইহাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন,

من فرق بینی و بین المصطفے فما عرفنی وما رای

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি বলে যে আমি মোহাম্মদ (সাঃ) হইতে পৃথক, সে আমাকে চিনে নাই, বরং সে পথ হারাইয়াছে।" এ বিষয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) নিম্নরূপ এক স্বপ্ন দেখেন।

"তৎকালীন মাদ্রাসা আহমদীয়া ও বুক ডিপোর মাঝখানে একটি ছোট খোলা ময়দান ছিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম ঐ ময়দানে একটি চেয়ার পাতা ছিল। একজন বলিল, হযরত রসুল করীম (সাঃ) আসিতেছেন। অমনি দেখি এক দিক হইতে তিনি আসিতেছেন। অপরদিকে তাকাইয়া দেখি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আসিতেছেন এবং উভয়ের লক্ষ্যস্থল চেয়ার। তখন আমি ঘাবরাইয়া গেলাম যে মস্ত ভুল হইয়াছে। হযরত মোহম্মদ (সাঃ) আসিতেছেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)ও আসিতেছেন। কিন্তু একটি মাত্র চেয়ার পাতা হইয়াছে। সাংঘাতিক ভুল এবং অপমানের কাজ হইয়াছে। তখন ভয়ে আমার এমন অড়ষ্ঠ অবস্থা যে উঠিয়া গিয়া চেয়ার আনিবার শক্তি পাইতেছি না এবং অন্য কেহও চেয়ার আনিবার জন্য যাইতেছে না। ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল এবং তাঁহারা চেয়ারের যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, আমার ভয় বাড়িয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে উভয়ে

চেয়ারের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। তখন মনে করিলাম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) পিছনে হটিয়া যাইবেন। কিন্তু না। দেখিলাম তিনি পিছনে হটেন না এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)ও আগে বাড়িতেছেন। তখন আমার মনে হইল এবার আমার হৃদয়ে স্পন্দন থামিয়া যাইবে। কিন্তু নিমিষে দেখিলাম তাঁহারা উভয়ে তাঁহাদের শরীরকে অল্প কাৎ করিয়া চেয়ারে বসিবার চেষ্টা করিতেছেন। অতঃপর তাঁহাদের দেহ পরস্পরের সহিত মিলিয়া এক হইতে লাগিল এবং যখন তাঁহারা চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন, তখন দেখা গেল সেখানে দুই জন নাই বরং একজন বসিয়া আছেন।" والشفع والوتر "দুই এবং এক" আয়াতটি উপরোক্ত তত্ত্বটি প্রকাশ করিতেছে যে, যদিও তাঁহারা দেখিতে সংখ্যায় দুই, কিন্তু রুহানী সত্ত্বায় এক ও অভিন্ন। হাদিসে বর্ণিত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) মৃত্যুর পর হযরত রসুল (সাঃ)-এর সহিত একই কবরে সমাহিত হওয়ার তাৎপর্যও ইহাই যে তাঁহাদের পরিণাম রুহানীভাবে অভিন্ন। উক্ত স্বপ্ন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর আবির্ভাব ও জীবন প্রকাশ এবং হাদিস তাঁহার পরিণামকে নির্দেশ করিতেছে। আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে আর একটি তত্ত্ব নিহত আছে। এই আয়াতে লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, বর্তমান যুগে লোকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে পৃথক মনে করিয়া তাহারা দুই মহাপুরুষের আগমনের প্রতীক্ষা করিবে। এই আয়াতে তাই বলা হইয়াছে যে প্রতিশ্রুত মাহদী ও ঈসা দুইজন নহেন বরং একজন। ইবনে মাজার হাদীসে আছে "لا المهدي الا عيسى ابن مريم" "মাহদী অপর কেহই নহেন বরং ঈসা ইবনে মরীয়ম।" এতদ্বারা ইহা বুঝান হইয়াছে যে একই ব্যক্তি দুই নাম ধরিয়া আসিবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হকীকাতুল ওহী ৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে নে'মতুল্লাহ ওলী তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

مهدی وقت و عیسی دوران
هر دو را شهسوار می بینم

'যুগ মাহদী ও কালের ঈসাকে এক অশ্বোপরি যুগল আরূঢ় দেখিতেছি।'

## বিলিয়মান রাত্রির অবসান—চারটি দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের আলোচনার মধ্যে এখন রহিয়া গিয়াছে والليل اذا يسر আয়াতের বর্তমান যামানায় প্রকাশ। দুই এবং একের ঘটনার পর আর এক রাত্রির উল্লেখ হইয়াছে, যাহা চলিয়া যাইবে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উপরের আলোচনা অনুযায়ী পূর্ণ চন্দ্রা উদয় হইলেও আরও এক রাত্রি অর্থাৎ এক শতাব্দী যাবৎ বিপদাবলীর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর উজ্জল দিবস আসিবে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিপদের আরও এক শত বৎসর গণনা করা যাইতে পারে। ১৩০০ হিজরী সন অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরকে যদি আমরা যজর ধরি, তাহা হইলে ১৪০০ হিজরী সনে অর্থাৎ ১৯৮১ খৃঃ অব্দে ১০০ শত বৎসরের অন্ধকার রাত্রির অবসান হয়। কিন্তু এক শত হিজরী বর্ষে সুর্যের হিসাবে ৩ বৎসর কম হয়। সুতরাং এই হিসাব ধরিলে ১৯৭৮ খৃঃ অব্দে ১০০ বৎসর শেষ হয়। ১২৭১ হিজরী

হইতে যদি আমরা ফজর গণনা করি, তাহা হইলে ১৩৭১ হিজরী অর্থাৎ ১৯৫২ খৃঃ অব্দে ১০০ বৎসর পুরা হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ'ঃ)-এর বেয়াত গ্রহণের বৎসর ১৮৮৯ হইতে যদি আমরা ফজর গণনা করি, তাহা হইলে ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে ১০০ বৎসর পুরা হয়। সুতরাং আহমদীয়তের তথা ইসলামের শেষ বিপদাবলীর ১০০ বৎসরেব রাত্রির অবসানের আমরা ৪টি সন-তারিখ পাইলাম। যথা—১৯৫২, ১৯৭৮, ১৯৮১, এবং ১৯৮৯ খৃঃ অঃ। এই চারটি সনে অথবা ইহাদের নিকটবর্তী সময়ে আগে পাছে আল্লাহ্তায়ালা বিভি রঙে আহমদীয়তের শক্তি ও উন্নতি প্রকাশ করিবেন। আমরা ১৯৫২ সনে মওছুদী জামাত দ্বারা সৃষ্ট পাঞ্জাবে বিরাট আহমদী বিরোধী আন্দোলন দেখিয়াছি। এই বিপ জামাতের ক্ষতি না করিয়া জামাতের পরিচয়কে ও কার্যক্রমকে প্রসারিত এবং জামাতকেন্ন শক্তিশালী করিয়া দিয়া যায়। প্রত্যেক বিপদ এ জমাতের অগ্রগতিকে ব্যাহত বা দুর্বল না করিয় সতেজ ও শক্তিশালী করিয়া যাইতে থাকিবে। اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد অর্থাৎ "ইসলাম প্রত্যেক কারবালার পর যিন্দা হইয়া উঠে।" ভবিষ্যৎ সনগুলিতে বা আগে পিছে নিকটবর্তী সময়ে ইহার উজ্জলতর নিদর্শন প্রকাশিত হইতে থাকিবে এবং ১৮৯০ খৃঃ অব্দে আহমদীয়তের বিজয়ের শতাব্দী আরম্ভ হইবে। ইহা আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া আছে। ইহাকে কেহ ঠেকাইতে পারিবে না।

এককালে পূর্ণ বিজয় না আসিয়া বিজয় ও আল্লাহতায়ালার সাহায্যের নিদর্শন পর্যায়ে পর্যায়ে আসিলে মোমেনগণের ঈমান উত্তোরত্তোর পরিপক্ক ও মজবুত হইতে থাকে। যেমন হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) হিজরতের জন্য গৃহ হইতে নিরাপদে বাহির হইয়া আসায় মুসলমানগণের জন্য প্রথম আনন্দের উপলক্ষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। যখন সওর গুহায় দুশমনগণের হস্ত হইতে তিনি বাঁচিয়া গেলেন, তখন মুসলমানগণের জন্য দ্বিতীয় আনন্দের উপলক্ষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। যখন হিজরত করিয়া হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) মদীনায় পৌছিলেন, তখন মুসলমানগণের তৃতীয় আনন্দ লাভ হইল। অতঃপর বদরের যুদ্ধ যখন কাফেরগণের পূর্ণ পরাজয় ঘটিল, তখন মুসলমানগণ চতুর্থ আনন্দ লাভ করিলেন। এমন হইতে পারে যে বর্তমান যামানায় অন্ধকার শতাব্দী অবসানের যে চারিটি মেয়াদ বাহির করা হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটিতে আহমদীয়াতের তথা ইসলামের জন্য কোন না কোন রঙে ফজরের প্রকাশ হইবে এবং মুসলমানগণের ঈমান বর্ধিত ও মজবুত হইতে থাকিবে। এই রাত্রির সম্বন্ধেই হযরত মসিহ মাউদ ( আঃ ) বলিয়াছেন—

دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے
اے میرے سورج نکل باہر کہ میں بے قرار

"ধর্মের দুশমনদের এখন দিন এবং আমাদের উপরে রাত্রি।
হে আমার সূর্য! উদিত হও, আমি বড়ই উদ্বিগ্ন।"

( ক্রমশঃ )

# হাদিস শরীফ

## আল্লাহতায়ালার ধ্যান ও মুরাকাবাহ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাজি আল্লাহু আনহুম) বর্ণনা করিতেছেন :—

একবার যখন আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে সোয়ারির উপর বসা ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ফরমাইলেনঃ বৎস, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলিতেছি, প্রথম তুমি আল্লাহতায়ালার ধ্যান রাখিবে, আল্লাহতায়ালা তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। তুমি আল্লাহতায়ালার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, তুমি তাঁহাকে নিকটে পাইবে। যখন কোন কিছু চাহিতে হয়, আল্লাহতায়ালার নিকট চাইবে, এবং জানিবে যে, সব মানুষ একত্রিত হইয়াও তোমার উপকার করিতে চাহিলে, তাহারা তোমার কোনো উপকার করিতে পারিবে না, উহা ছাড়া যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা চাহেন এবং তোমার ভাগ্যে উপকার লিখেন। যদি তাহারা তোমার অনিষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহারা তোমার কোনো অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এই ছাড়া যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার কিস্‌মতে অনিষ্ট লিখেন। কলম সব উঠাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তকদিরের পুস্তক শুষ্ক হইয়াছে।”

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

“আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, তুমি তাঁহাকে তোমরা সম্মুখে পাইবে। তুমি আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্বাচ্ছন্দের সময়ে চেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে অভাবের সময় চিনিবেন। জানিবে, যাহা তুমি ভুলিয়া যাও এবং তোমার কাছে পৌঁছে না, তাহা তোমার নসিবে ছিল না এবং যাহা তুমি পাইয়াছ, তাহা তুমি পাওয়া ছাড়া থাকিতে পারিত না। কারণ, তকদিরের লিখন এমনি ছিল। জানিবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য সবুরকারীদের সঙ্গে থাকে এবং আনন্দ অস্থিরতার সহিত মিলিত থাকে এবং সব অনটনের পর স্বাচ্ছন্দ্য ও সুদিন আসে।”

## একীন, তাওয়াক্‌কুল, এবং তৌফিক-ইলাহী

(১) হযরত জাবের রাজি আল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি এক যদ্ধ ব্যাপারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় হুজুর সাহাবীগণ সহ এক দিন দুপুর বেলা এক উপত্যকায় পৌঁছিলেন। সেখানে কাঁটা যুক্ত অনেকগুলি গাছ ছিল। তিনি (সাঃ) সেখানে অবতরণ করিলেন। লোকগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিভিন্ন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে গেলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে আরাম করিতেছিলেন। তাঁহার তলোয়ার উক্ত গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন। আমরা সকলেই

ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ শুনিলাম যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া সেখানে দেখিলাম যে, এক গ্রাম্য লোক তাঁহার নিকটে দাঁড়ান। তিনি (সাঃ) বলিলেন, "সে আমার ঘুমের মধ্যে আমার তলোয়ার আমার উপর ধরিয়াছিল। আমি সজাগ হইয়া দেখিলাম তাহার হাতে তলোয়ার ধরা। সে আমাকে বলিতে লাগিল: 'বল, এখন কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে?' আমি তিন বার বলিলাম: 'আল্লাহ্, আল্লাহ্ আল্লাহ্'। ইহাতে তলোয়ার তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সে কিছুই করিতে পারে নাই।" হুজুর (সাঃ) তাহাকে কোন শাস্তি দেন নাই।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, জাবের (রাজিঃ) বলেন যে, 'যাতির রিকায়ের' যুদ্ধের ঘটনা। এক দিন আমরা একস্থানে ছায়াযুক্ত বৃক্ষ শ্রেণীর নিকটে পেঁাছিলাম। সেখানে বিশ্রাম করা সাব্যস্ত হইল। আমরা আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য একটি ছায়াদার বৃক্ষ নির্বাচন করিলাম। তিনি বিশ্রাম করিতে ছিলেন। হঠাৎ এক মুশ্‌রিক সেখানে উপস্থিত হইল। হুজুর (সাঃ আঃ)-এর তলোয়ার গাছে ঝুলান ছিল। তিনি নিদ্রা যাইতে ছিলেন। সে তলোয়ার ধরিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিল এবং বলিলঃ 'তুমি আমাকে ভয় কর না নাকি? হুজুর (সাঃ আঃ) বলিলেনঃ 'না'। সে বলিলঃ কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে? তিনি (সাঃ) বলিলেন: 'আল্লাহ্‌তায়ালা।' হুজুরের এই প্রত্যুত্তরে ঐ কাফেরের মধ্যে এরূপ প্রভাব পড়িল যে, তলোয়ার তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। হুজুর (সাঃ) তলোয়ার উঠাইয়া বলিলেন: 'এখন আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারে? ইহাতে সেই ব্যক্তি হতবিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল: 'আপনি (সাঃ) সর্বাপেক্ষা উত্তম গ্রেফতারকারী।' অর্থাৎ আপনি (সাঃ) দয়া করুন, সদয় ব্যবহার করুন' আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) বলিলেন; "তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ (উপাস্য-আরাধ্য) নাই এবং আমি আল্লাহ্‌তায়ালার রসুল।" সে বলিল: 'আমি মানি না।' কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভবিষ্যতে আপনার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করিব না এবং তাহাদের সঙ্গেও মিশিব না, যাহারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে।" হুজুর (সাঃ আঃ) তাহাকে মুক্তিদান করিলেন। সে তাহার দলের লোকদের সঙ্গে গিয়া মিশিল এবং তাহাদিগকে বলিল, "আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি, যিনি পৃথিবীতে সব চেয়ে ভাল মানুষ।"

(ক্রমশঃ)

'হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

### হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

# অমৃত বানী

মানুষ ও খোদার সম্বন্ধ স্থাপন করিবার বিষয়ে কোরআন কমীমের শিক্ষা—
ইসলামী কলেমার বৈশিষ্ট্য—ইসলাম শব্দের গুঢ়ার্থ——ঈমানদার
সেই ব্যক্তি, খোদা যাহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

"কোরআন শরীফের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে, খোদা যেমন, 'ওয়াহেদ ও লা শরীক' তথা এক ও অংশীবিহীন, তেমনি স্বীয় প্রেমের দিক দিয়া মানব যেন তাঁহাকে ওয়াহেদ ও লা শরীক' প্রতিপন্ন করে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা, যাহা সব সময় মুসলমান আবৃত্তি করিয়া থাকে, ইহারই প্রতি সংকেত করে। কারণ 'ইলাহ' (اله) اله, ধাতু হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ এমন প্রাণবল্লভ ও প্রিয়, যাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই কলেমা, তৌরীতও শিক্ষা দেয় নাই এবং ইঞ্জিলও দেয় নাই, শুধু কোরআন শরীফ ইহা শিক্ষা দিয়াছে। ইসলামের সহিত এই কলেমার এরূপ সম্বন্ধ যেন ইহা ইসলামের পদক স্বরূপ। এই কলেমাই পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদের মিনার হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হয়। খ্রীষ্টান ও হিন্দু তাহাতে চটে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রেমভরে আল্লাকে স্মরণ করা তাহাদের নিকট পাপ। ইহা ইসলামেরই বিশেষত্ব যে, প্রভাত হওয়া মাত্র ইসলামী মুয়াজ্জিন উচ্চৈঃস্বরে বলে: اشهد ان لا اله الا الله অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ আমাদের প্রিয় ও উপাস্য নাই। তারপর দ্বিপ্রহরের পর এই ধ্বনিই ইসলামী মসজিদগুলি হইতে আসে। তারপর আসরের সময়েও এই ধ্বনি, আবার মগরেবেও এই ধ্বনি, আবার এশাতেও এই ধ্বনিই উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হয়। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে কি এই দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়?

অতঃপর, ইসলাম শব্দের অর্থও প্রেম নির্দেশ করে। কারণ, খোদাতা'লার সম্মুখে মস্তক স্থাপন ও মান প্রাণে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হওয়া, যাহা ইসলামের অর্থ, এরূপ এক আমলী বা ব্যবহারিক অবস্থা, যাহা প্রেমের প্রস্রবন হইতে নির্গত হয়। ইসলাম শব্দ দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, কোরআন শরীফ শুধু মৌখিক ভাবে প্রেমকে সীমাবদ্ধ করে নাই, বরং ব্যবহারিক ভাবেও প্রেম ও আত্মোৎসর্গের কথা শিক্ষা দেয়। পৃথিবীতে অন্য আর কোন ধর্ম আছে কি, যাহার

প্রবর্তক উহার নাম ইসলাম রাখিয়াছেন? ইসলাম অত্যন্ত প্রিয় শব্দ। সত্য পরায়ণতা, আন্তরিক নিষ্ঠা ও প্রেমের ভাবে এই শব্দ ভরপুর। সুতরাং ধন্য ঐ ধর্ম, যাহার নাম ইসলাম। সেইরূপ, খোদার প্রেম সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন :

والذين امنوا اشد حبا لله ٥

অর্থাৎ, ঈমানদার সেই ব্যক্তি, খোদা যাহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়'।

আর একস্থানে বলা হইয়াছে :

فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا ٥

অর্থাৎ, খোদাকে সেই ভাবে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতাকে স্মরণ করিয়া থাক, বরং ততোধিক প্রেমের সহিত স্মরণ করিবে।

আরও একস্থানে বলা হইয়াছে :

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٥

অর্থাৎ, "যাহারা তোমার অনুবর্তিতা করিতে চায়, তাহাদিগকে বল, 'আমার কোরবানী, আমার মরণ ও আমার জীবন সকলই আল্লাহ্‌তা'লার জন্য'। যে আমার অনুবর্তিতা করিতে চায়, তাহাকেও এই কোরবানী করিতে হইবে।"

অন্য আর এক স্থানে বলা হইয়াছে :

"যদি তোমাদের প্রাণ, তোমাদের বন্ধু, তোমাদের বাগান ও ব্যবসায়কে খোদা ও তাঁহার রসুল অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া মনে কর, তবে পৃথক হইয়া পড়—যে পর্যন্ত না খোদাতা'লা মীমাংসা করেন।"

এইভাবে আর একস্থানে বলা হইয়াছে :

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۔ انما نطعمكم
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٥

অর্থাৎ "তাঁহারাই মুমেন, যাঁহারা খোদার প্রেমে মিসকীন ও বন্দীদিগকে আহার দেয়, এবং বলে : আমরা শুধু খোদার প্রেমে ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে দিই। আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না।"

বস্তুতঃ কোরআন শরীফ এই প্রকার আয়াতে ভরা, যেখানে লিখিত আছে যে, তোমরা তোমাদের কথা ও কার্যের দ্বারা খোদার প্রেম প্রদর্শন কর এবং খোদাকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রেম কর।"

( "খ্রীষ্টান সিরাজুদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর" )

# জুমার খোৎবা

## সাইয়েদানা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

[রাবওয়া, মসজিদ মুবারকে ২৫।২।৭২ তাং প্রদত্ত এবং 'আলফজল' ২৫।৩।৭২ তাং প্রকাশিত]

নববর্ষে সমস্ত দায়িত্ব পালনে সার্বিক চেষ্টা পূরা মাত্রায় আরম্ভ করুন।

পার্থিব কোন ক্লেশ বা বিপর্যায় জামাতের কোন কুরবানীর ব্যাপারে কোনও বাধা ঘটাইতে পারে না।

আমাদের কোনও চেষ্টা অর্ধ বা অসম্পূর্ণ হওয়া উচিত নয়।

فاذا فرغت فانصب O

সূরা ফাতেহা এবং "ফা-ইযা ফারাগ্‌তা ফান্‌সাব্" ('আলাম্ নাশ্‌রাহ্' আয়াত ৮) তেলাওয়াৎ পূর্বক হুজুর ভাষণ দেন :—

পৃথিবীতে মানুষের সংক্ষেপ জীবন। তবু, ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার দৈর্ঘ দ্বারাও চিত্ত তাহাদের ভরিয়া উঠে। কিন্তু যখন সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এবং মানুষ পশ্চাতের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তাহাদের কাছে জীবন একেবারেই ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার, যখন সম্মুখের দিকে তাকায়, তখন ভাবে যে, হয়ত কখনো মরিবে না। শৈশবে মনে করে কখনো যুবা হইবে না। যুবক মনে করে কখনো বার্ধক্য পর্যন্ত বাঁচিবে না। বৃদ্ধ হইয়া মনে করে যে হয়ত কেয়ামত পর্যন্ত বাঁচিবে। বহু মানুষের কার্য কলাপ অন্ততঃ আমাদিগকে ইহাই বলে।

যেহেতু মানুষ বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া তাহার জীবনের দিন গুলি পূর্ণ করে, এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার প্রকৃতি এরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, ছাত্র প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, এইরূপে দশম শ্রেণী বা মেট্রিক, আই এ, আই এস সি, বি এ, বি এস সি পর্যন্ত পৌঁছে। আরো যখন অধ্যয়ন করে, এম এ, এম এস সি পাশের পর এক, দুই বা তিন বৎসরের কোর্সও পাশ করে।

যাহা হউক, মানুষ তাহার জীবনের দিন গুলি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে এবং ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইতে থাকে। যখন বড় হইয়া জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় কার্যে যোগদান করে, তখন তিন বৎসর, পাঁচ বৎসর, পরে সাত বৎসরের পরিকল্পনা করে। কখনো বলে না যে, একটা পরিকল্পনাই যথেষ্ট এবং জাতি শেষ পর্যন্ত তদনুযায়ী কাজ করিয়া ইহাকে কামিয়াব করিবার চেষ্টা করে।

তবু, মানুষ সময়ের দিক দিয়া তাহার জীবনের বিভাগ করে। আল্লাহ্‌তায়ালাও বিভাগ বাটোয়ারা করিয়াছেন। কতক সময়ের জন্য বলিয়াছেন, দুগ্ধ পান করিবে, আর কিছু খাইবে না। তারপর বলিয়াছেন, সামান্য অন্য জিনিষও মিলিত করিয়া খাইবে, তবে ছোলা, মকাই খাইবে না। বস্তুতঃ, খাবার দিক দিয়া প্রত্যেক বয়সে ক্রমশঃ এক একটা পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এইরূপে, মানব জীবনের এই দিকটা বিভিন্ন আকারে বিভাগ করা হইয়াছে। তারপর, আমরা দেখিতে পাই যে, খেলা ধুলারও এই অবস্থা। বস্তুতঃ, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা এই নীতিই দেখিতে পাই।

জীবন বিভাগ বণ্টনাবৃত এবং ক্রম বর্ধনশীল উন্নতির সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। নচেৎ মানুষ তাহার স্বভাব সুলভ দুর্বলতার ফলে এই সব উন্নতি করিতে পারিত না. যাহা সে ক্রমে ক্রমে করিয়া থাকে।

সেইরূপ, ইবাদাতেও ধাপে ধাপে উন্নতির জন্য নামাযে সময়ের ব্যবধান রাখা হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন নাই যে, তোমরা সারা দিনের নামায এক ওয়াক্ত পড়িবে। এই জন্য তিনি দিনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। রাত্রি ও দিনের ইবাদত পৃথক করিয়াছেন। যেমন সারা দিন কাজে ব্যপৃত থাকিয়া উহার অবসানের পর রাত্রির ইবাদত যখন আসে, তখন উহা কঠিন হয়।

এই নীতি মানব জীবনের সহিত বস্তুতঃ এমন ভাবে জড়িত দেখা যায় যে, আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। ইহার অর্থ প্রত্যেক প্রথম দর্জা বা প্রথম পর্যায়ের একটা কাজ সম্পূর্ণ হইতে থাকে, এবং পরবর্তী পর্যায়ের বীজ বপনও হইতে থাকে। যেমন নবম শ্রেণীর কোর্স পূরা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দশম শ্রেণীতে প্রবেশ চলে। মেট্রিক কোর্স পূরা হইলে আই এ, আই এ সি. তথা ইন্টার মিডিয়েটের তৈরীর জন্যও ব্যবস্থা হইতে থাকে।

বস্তুতঃ, আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমের এই আয়াতে-করিমায়ও বলেন, তোমরা এক পর্যায়ের কাজ হইতে ফারেগ বা অবসরও হইবে এবং অন্য পর্যায়ে প্রবেশও করিতে থাকিবে। যদি তোমরা আমার প্রেমের শীর্ষ স্থানে [তোমাদের যোগ্যতার গণ্ডী অনুযায়ী] পৌঁছিতে চাও, তবে এই নীতি স্মরণ রাখিবে। যখন ‘ফারেগ হওয়ার’ প্রশ্ন উঠে, অর্থাৎ একটি পর্যায় পূরা হইতে থাকে, তখন বুনিয়াদী রূপে তোমাদিগকে একটি শিক্ষা এই দেওয়া হইতেছে যে, কাজ যেন ‘ফারাগতা” সম্বলিত মাত্রায় পুরা হইয়া উঠে। ‘ফারাগা’ অর্থ আরবী ভাষায় কোনো কাজ বা কোনো বিষয়কে উহার পূর্ণ সীমায় পৌঁছানো। যেমন, ‘মুন্‌জিদে’ লিখিত আছে, ‘ফারাগা মিনাশ্ শাই’ অর্থ “আতাম্ম হু” অর্থাৎ কোনো কাজ বা বিষয়কে কামেল ও সম্পূর্ণ করা হইলে, উহার সবগুলি অংশ পূরা হইল, উহা আরবী ভাষার দিক হইতে ‘ফারাগতা’ হইয়া থাকে। যেমন, দশম শ্রেণীর যে ছাত্র দুইটি বিষয়ে ফেল করে, তাহাকে ‘ফারাগতা’ বলা হইবে না। অর্থাৎ তাহার কাজ পূর্ণ হয় নাই। কারণ দশম শ্রেণীর পরীক্ষার প্রস্তুতির বিষয়ে সে তাহার দায়িত্ব পালন পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন করে নাই। এজন্য তাহার পরবর্তী পর্যায়ের উন্নতি বা উহার জন্য চেষ্টার প্রশ্ন উঠে না।

আল্লাহতায়ালা বলেন : “ফা-ইযা ফারাগতা” অর্থাৎ যখন তোমরা এক পর্যায়ের কার্য হইতে এবং দায়িত্ব হইতে পুরাপূরি ফারেগ হও, এই অর্থে যে, সেই দায়িত্ব পালন যে সীমায় সম্পন্ন হওয়া উচিত, সেই সীমায় উহা তোমরা পূরা কর। উহাতে যেন কোনও দিক দুর্বল বা ত্রুটীযুক্ত ও অসামাপ্ত না থাকে। তোমরা তাহা পূরাপুরি সমাধা করিবে। অতঃপর উহার যাবতীয় অংশ উৎকৃষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করিলে তোমরা সেইখানে থামিবে না। কারণ জীবনের প্রচেষ্টা-ক্ষেত্রে

থামা তো মৃত্যুবৎ। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "ফান্‌সাব।" অতঃপর অন্য এক পর্যায় আরম্ভ হইল। ইহার জন্যও তোমাদের শেষ সীমানার প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

'নাসাবা' শব্দের এক অর্থ 'রিফ্‌য়াৎ'—উচ্চ মর্যাদা এবং দৃঢ়রূপে কায়েম করা। ইহার এক অর্থ ('ফান্‌সাব' যে সিগায় আসিয়াছে, উহার অর্থ 'জাহাদা' ও 'ইজতাহাদা')। অর্থাৎ, পূর্ণ শক্তি দিয়া কার্য সম্পাদন। সুতরাং, যদি আমরা ইহার ধাতুগত অর্থ নেই, তবে ইহার অর্থ হয়, দায়িত্বের পরবর্তী পর্যায়, এক তো উহা 'রিফয়াতের' পর্যায়। অর্থাৎ একটা ভিত্তি ইতিপূর্বে পত্তন হইয়াছে। এখন উহার উপর দ্বিতীয় তলা তৈরী হইবে। অথচ, ইহাও বলা হইয়াছে যে, দুতলা, প্রথম তলাকেও মজবুত করিবে।

এ পৃথিবীর প্রাসাদগুলি তো কোনো কোনো সময় দ্বিতল সহ্য করিতে পারে না। যেমন কোনো পাকা বাড়ী সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, ইহার ভিত্তি দ্বিতলের করা হয় নাই এবং কোনো সময় বলেন যে চার তলা করা যায়, পাঁচ তলা তৈরী হইতে পারে না। সুতরাং ইহাতে জানা যায় যে প্রত্যেক পরবর্তী তল প্রথম তলকে মজবুত করে না, বরং উহাকে দুর্বল করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক (রূহানী) জগতে প্রত্যেক পরবর্তী পর্যায় পূর্বেকার পর্যায়কে সুদৃঢ় করে এবং উহার উন্নতির কারণ হয়। 'ফান্‌সাবে' এই হকিকতের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে।

## শেষ মঙ্গল বা শুভ-পরিণাম

সুতরাং, জড় ও রূহানী কাজের মধ্যে একটা দেদীপ্যমান পার্থক্য এই যে, রূহানী বা আধ্যাত্মিকরূপে যে দ্বিতল নির্মিত হয়, উহা প্রথম তলাকে দৃঢ় করে এবং উহাকেই আমরা 'আঞ্জাম ব-খায়ের' বা ভাল পরিণাম বলি। এই কারণে, কোনো মানুষ বা ব্যক্তির জীবন, যাহা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া চলে, উহার শেষ পর্যায় দুর্বল হইলে পূর্বেকার সব পর্যায়গুলিই দুর্বল হইয়া পড়িবে। সুতরাং মনে করা হইবে যে, তাহার শেষ মঙ্গল বা শুভপরিণাম হয় নাই।

সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে জড় ও আধ্যাত্মিক (রূহানী) দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ আছে। যেমন, জড় দিক হইতে একতলা তৈরী করা হইলে উহার উপর দুতলা নির্মান করা যায় না। কারণ, প্রথম তলা মজবুত নয়, বা ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে ইহার ভিত্তি দুই তলা সহিবে নয়, এক তলা মাত্র হইতে পারে। এক তলার অধিক বোঝা বহন করিতে পারে না। কিন্তু রূহানী দিক হইতে দ্বিতল ছাড়া প্রথম তলা দুর্বল থাকে এবং শেষ তলা ছাড়া ত সবই উজাড। কারণ, এই প্রকারে শেষ মঙ্গল হয় না। অন্য কথায়, আল্লাহ্‌তায়ালার শীর্ষ রেযা (সন্তুষ্টি) লাভের যখন সময় আসিল, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ চরম অসন্তুষ্টি খরিদ করিল।

সুতরাং, এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, আমি তোমাদের প্রকৃতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায় রাখিয়াছি। তোমরা এই গুলি

অতিক্রম করিয়া এবং শেষ সীমানার চেষ্টার পর শেষ মঞ্জিল বা গন্তব্যে পৌঁছিতে পার। যেমন, নবী করীম সা'ল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিই গভিরভাবে লক্ষ্য করিলে আপনারা সেখানেও দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার সময়েও মুসলমানগণ ক্রমশঃ উন্নতি করেন। তাঁহারা তাঁহার (সাঃ) কুওয়তে কুদ্সিয়া (পবিত্র করণ শক্তি) এবং শিক্ষা (তালিম-তরবিয়ত)-এর ফলে পর্যায়ক্রমে (মঞ্জিল-ব-মঞ্জিল) অগ্রসর হইতে থাকেন এবং উন্নত হইতে উন্নততর হইতে থাকেন। শেষ পর্যায়ে তাঁহারা সার্বিক চেষ্টা ও কুরবানী করিয়া শেষ সীমানায় পৌঁছিয়াছিলেন এবং এইরূপে তাঁহারা শেষ মঙ্গল বা শুভ পরিণাম লাভ করেন। আল্লাহ্তায়ালার এই ধ্বনি তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এই শেষ পর্যায়েই জান্নাত নহে। কারণ ইহার পর পদস্খলনে বা স্থবিরতায় ধপ করিয়া দোজখে নিপতিত হয়। এজন্য, এই প্রেক্ষিতে ইহা বড়ই বিপদ সঙ্কুল স্থান।

বস্তুতঃ, এই ক্ষুদ্র আয়াতে বড়ই জ্ঞানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যে পর্যায়েই যে কাজ তোমাদের সোপর্দ হয়, তাহা 'ফারাগতা' রূপে করিতে হইবে। অর্থাৎ, তাহা পুরাপুরি করিবে। কামেল এবং পরিণত রূপে করিবে। সব অংশ পুরা করিবে। আরবী ভাষা ও অভিধান অনুযায়ী 'ফারাগতার' ইহাই অর্থ। বলা হইয়াছে, কাজ পুরা হইলে সেখানে বসিয়া পড়িবার নয়। মনে করিবে না যে, কাজ যাহা করিবার ছিল তাহা করা হইয়াছে। যে পর্যন্ত এই পৃথিবীতে জীবিত থাক, তোমাদিগকে তোমাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

অবশ্য সেই জগৎ, অর্থাৎ পারত্রিক জীবন সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি না। তবে মানুষের (সঠিক) ধারণা এই যে, সেখানে পার্থিব কোন কর্ম হইবে না, অবশ্য সেখানেও কর্ম থাকিবে। কিন্তু সেই কর্ম (আমল) পরীক্ষা রূপে নয়। আপনারা কি মনে করেন যে, জান্নাতে আল্লাহ্তায়ালার বান্দা তাঁহার শোকর আদায় করিবে না? শোকর আদায় করাও ত অবশ্য একটি আমল। তাঁহারা কি আলহাম্দুলিল্লাহ্ পড়িবে না? যদি তাহারা আলহাম্দুলিল্লাহ পাঠ করে, তবে ইহাও ত একটা আমল, যদিও সেই 'আলহাম্দুলিল্লাহ্' এই দুনিয়ায় পড়া অপেক্ষা অধিক 'বসীরত' বা অন্তর্জ্ঞান সহ পাঠ করা হইবে। কারণ, সে খোদাতায়ালার পেয়ার ও তাঁহার প্রেমকে এই জগতে অপেক্ষা অধিকতর 'বসীরত' ও দিব্য দৃষ্টিতে দেখিবে। এজন্য সেখানকার 'হাম্দ' ইহলোকের 'হাম্দ' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে।

বস্তুতঃ, যখন আমরা বলি যে, ইহলোক কর্মক্ষেত্র বা আমলের দুনিয়া, তখন ইহার অর্থ শুধু এইটুকু যে, ইহা সেই কর্মের জগৎ-যাহাকে পরীক্ষা বলা হয়, অর্থাৎ, ইহা পরীক্ষার জগৎ। এই পরক্ষা-জগৎ সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন, যদি আমি শয়তান দ্বারা তোমাদিগকে

কশাঘাত করাই, তবু আমার 'হামদ' তোমাদের করিতে হইবে। যদি তোমরা ইত্যাবস্থায়ও আমার হামদ (শোকর) না কর তবে আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব। পক্ষান্তরে 'পারত্রিক জীবন' সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, সেখানে কোনো বাচালতা বা অনাবশ্যক কথা তোমরা শুনিতে পাইবে না। সেই জগতই হইবে ভিন্ন। কিন্তু সেখানেও এরূপ কর্ম (আমল) অবশ্য জারী থাকিবে, যাহাকে পরীক্ষা বলা যায় না—এখন যেমন বাচ্চাদের একটা পরীক্ষা (এবং ইহা মাতা-পিতা গ্রহণ করেন, কিন্তু যতটুকু এই পরীক্ষার প্রশ্ন) মাতা-পিতা হয় মনে মনে ঠিক করেন বা প্রকাশ্যে জানান যে, প্রথম বিভাগে পাশ করিলে এই পুরস্কার দিবেন। ইহাও যাহা হোক, একটা কর্ম এবং ইহার ফল আছে। তাঁহারা সন্তানের পরীক্ষা নেন বা একটা পরীক্ষার সহিত আপনাকে সংযুক্ত করেন। আরো একটা বাৎসল্য, একটা পেয়ার আছে, যাহা ২/১ বা ৩/৪ বৎসরের ছোট্ট শিশু মাতৃ ক্রোড়ে পায়। সে তাহার মায়ের স্কন্ধে বাহু বিস্তার করিয়া তাঁহার সহিত জড়াইয়া পড়ে। তখন মাতা স্বয়ং তাহাকে পেয়ার করিতে থাকেন। উহা যদিও কর্মের প্রতিফল, তবু পরীক্ষামূলক কর্মফল নহে। কর্ম এ হিসাবে আছে যে, শিশু আসে, মায়ের গলায় বাহু রাখে এবং গলা লাগায়। মা তাহাকে আদর করেন। বস্তুতঃ এই প্রকারেই ভবিষ্যৎ পারত্রিক জীবনে আল্লাহতায়ালার প্রীতি মানবের কর্মের সহিত সম্পর্ক রাখিবে কিন্তু এরূপ কর্মের সহিত নহে যাহাকে আমরা পরীক্ষা বলিতে পারি।

কিন্তু এখানে—এই জগৎ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, তোমাদিগকে بأساء وضراء অভাব ও দুঃখ-দারিদ্র, ক্লেশ ও পীড়া প্রভৃতি তোমাদের ঘটিবে, কিংবা তোমরা এরূপ কথা শুনিবে, যাহা তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যে তোমাদের সহ্য করিতে হইবে। সুতরাং, পরীক্ষা রূপে মানুষের জীবনে বিভিন্ন পর্যায় ও যুগাবর্তন উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, আল্লাহতায়ালা মানুষের প্রচেষ্টাকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

## দ্বীনি পরিকল্পনা—বিভিন্ন যুগাবর্তন ঃ

এই উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন পরিকল্পনা নির্ধারণ করিয়াছেন। কোনো কোনো দ্বীনি পরিকল্পনার সম্বন্ধ এক দিনের সহিত এবং কোনো কোনো দ্বীনি পরিকল্পনার সম্পর্ক এক মাসের সহিত। নামায দিনের বিভিন্ন ওয়াক্তের সহিত সম্পৃক্ত। সম্পূর্ণ দিনই নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন নাই যে, সারা দিন নামায পড়িবে। ফরমাইয়াছেন, পাঁচ বার উহা অবশ্য পালনীয় এবং ষষ্ঠ বার ইহা প্রেমাবেগে পড়িতে হইবে (দিনে পাঁচবার নামাযের পর রাত্রিতে আমরা 'তাহাজ্জুদ' নামায পড়ি)। অন্য কথায়, দিনের (২৪ ঘণ্টার) এক বৃত্ত এক পর্যায়। আল্লাহতায়ালা বলেন নাই যে এক দিন নিয়মিত ভাবে সকাল, দুপুর, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা, ইশা, অতঃপর তাহাজ্জুদ পড়িয়া এই বলিয়া বেশ আরামে বসিয়া যাও যে, তোমাদের যাহা কর্তব্য ছিল তাহা শেষ

হইয়াছে। তিনি এইরূপ বলেন নাই। তোমাদের কর্তব্য, 'ফারাগ্‌তা' অনুযায়ী, পূর্ণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, তৎসঙ্গে আনুষঙ্গিক সব বিষয় গুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে। যেমন তোমরা প্রত্যেক নামাযের সঙ্গে নফলও পড়িবে। নামাযের পূর্বে খুবই সাবধানে 'অযু' করিবে। নামাযে সভয়ে, বিগলিত চিত্তে গদগদভাবে দোয়া করিবে। তারপর রাত্রিতে 'তাহাজ্জুদ' নামাযও আদায় করিবে। অন্য কথায়, নামাযের দিক দিয়া নামাযের দায়িত্বের সবগুলি অংশই যেন পূর্ণ হয়। কিন্তু ইহাতেও তোমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। পরদিন ভোর হইতে তোমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। পর দিন ভোর হইতে তোমাদের জন্য নতুন করিয়া দায়িত্বের আবর্তন (পালা) শুরু হইবে।

তবু, রোজার দিক হইতে নতুন পর্যায় শুরু হয় নাই। ইহার জন্য আপনাদের ১১ (এগার) মাস অপেক্ষা করিতে হয়। তারপর রমজানের এক মাস ইবাদতের। ইহাও আর এক প্রকার ইবাদতের এক নূতন পর্যায়। অতঃপর আপনারা এক মাসের এই পর্যায় পূরা করিয়া বলেন না : "আল্লাহর কসম, আর রোজা থাকিব না।" কখনো কোনো মোমেনের হৃদয় বা মুখ হইতে এই কথা বাহির হয় কি? এ জন্য বাহির হয় না যে, সে জানে তাহার জীবনের এক পর্যায় বা পরিকল্পনা, যাহা বৎসরের এক মাস সম্পর্কীয় ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। এখন আর একটি পালা বা পরিকল্পনা আগামী বৎসরের জন্য শুরু হইতেছে। ইহা দ্বারা আমরা একথাও জানিতে পারি যে, রমযানের জন্য এগার মাস আমাদের প্রস্তুতি করিতে হইবে। অতঃপর, ইহার Climax (ক্লাইমেক্স) ইহার শেষ চুড়া—ইহার পরিণাম রমযান রূপে প্রকাশিত হইবে।

তারপর হজ্জ। বস্তুতঃ ইহা জীবনে এক বার ফরয হয়। অন্য কথায়, সারা জীবনে ইহার একটি পর্যায় (পালা) উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা তওফিক দেন, তাঁহারা একাধিক বারও হজ্জ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ইবাদতের দিক হইতেও আমি যাহা সুস্পষ্টরূপে বলিতে চাই তাহা এই যে, বিভিন্ন পর্যায় আছে। কোনটি বিষয়ের পর্যায় একদিনের সহিত সম্পৃক্ত, কোনটির এক বৎসরের সহিত। আর কোনটির গোটা জীবনের সহিত। বৎসর সম্পৃক্ত পালা 'যাকাতের'ও। যদিও ইহার সম্পর্ক এক বৎসর উত্তীর্ণ হওয়াতে আসে; কিন্তু ব্যয় করার দিক হইতে একটা পর্যায় এমনও আছে, যাহা দুই দিন পরেও উপস্থিত হওয়া সম্ভব। যেমন, জেহাদের জন্য অর্থ দান। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনকালে যে সব যুদ্ধ হইয়াছিল, প্রত্যেক যুদ্ধের সময়েই ঘোষণা করা হইত যে, 'মালী কুরবাণী' কর। কোনো যুদ্ধ এক সপ্তাহ পরে হইয়াছে, কোন যুদ্ধ দীর্ঘ কাল পর এবং কোনো যুদ্ধ অল্প সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ, বিভিন্ন যুদ্ধ একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হয় নাই।

(ক্রমশ:)

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

# হযরত ইমাম মাহদী ( আঃ )-এর সত্যতা

মূল ঃ হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী ( রাঃ )

ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—১০ )

## হযরত মীর্যা গোলাম আহামদ (আঃ)-এর দাবীঃ

ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিতভাবে আহমদীয়া বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোকপাত করেছি। এরপর একথা অনস্বীকার্য যে আহমদীয়া বিশ্বাস যথার্থই ইসলামী বিশ্বাস।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে ঐ সকল অসুবিধা এবং সন্দেহের কথাও বর্ণনা ক'রেছি যেগুলো আমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে আপত্তিজনক হিসেবে উত্থাপন করা হয়ে থাকে। আমরা প্রমান করেছি যে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে এই সকল আপত্তি সহজেই খণ্ডন করা সম্ভব এবং এগুলো নিতান্তই ভিত্তিহীন।

এখন আমরা আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীর কথা বলবো এবং এই সকল দাবীর অন্তর্নিহিত অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমান সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রথমে তিনি কী দাবী করেছেন সে কথাই বলা হবে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে প্রত্যেক দাবীর সমর্থনে যে সকল যুক্তি-প্রমান রয়েছে সেগুলো আলোচনা করা হবে।

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর দাবী নিম্নরূপ :—

তিনি আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুত সেই মহাপুরুষ যিনি বর্তমান যুগে মানব জাতিকে আল্লাহর পথে পরিচালনা ও পথ-প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

তিনি হাদীস সমুহে বর্নিত "প্রতিশ্রুত মসীহ" এবং তিনি সেই ব্যক্তি হযরত রসুল করীম (সাঃ) যাঁকে "মাহদী" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাবলীতে যে মহাপুরুষের বর্তমান যুগে আগমনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেগুলো পূর্নতা লাভ করেছে।

তিনি দাবী করেছেন যে, তাঁর উপর যে মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাহলো ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁকে কুরআন করীমের বিশেষ জ্ঞান দ্বারা বিভূষিত করা হয়েছে।

তাঁর এই জ্ঞানের আলোকে সমুদ্ভাসিত পথে সকল মুসলিম এবং অপরাপর লোকেরা বর্তমান যমানায় আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।

তিনি দাবী করেছেন যে, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হলো ইসলাম, পবিত্র কুরআন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর গৌরবকে পৃথিবীব্যাপী সম্প্রসারিত করা। এ কথার অর্থ এই যে, ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে এবং এর দ্বারা প্রমানিত হবে যে, আল্লাহতালা ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষে রয়েছেন। সুতরাং যেহেতু আল্লাহতা'লা স্বয়ং ইসলাম ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর স্বপক্ষে রয়েছেন, সেজন্য যে ব্যক্তি ইসলাম এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর স্বপক্ষে থাকবে না সে আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না।

তিনি দাবী করেছেন যে, যেহেতু হযরত রসুল করীম (সাঃ) সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁরই পতাকাতলে সারা দুনিয়াই একত্রিভূত হওয়ার মহান প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেজন্য তাঁর ভবিষ্যদ্বানী সমূহে তাঁরই উম্মত হতে "উম্মতী মামুর" (উম্মতী প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি) আবির্ভূত হওয়ার কথা। এই ভবিষ্যদ্বানী পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতেও রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মে পূর্ববর্তী কোন ধর্ম-সংস্কারকের দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের যে সকল ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে সেগুলো মূলতঃ এই যুগে আগমনকারী ইসলাম ধর্মাবলম্বী মসীহ ও মাহদীর দ্বারাই পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেক তাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ পরিপূরণের উদ্দেশ্যে কোন এক ব্যক্তির আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে আসছে। আজ সমস্ত মানবীয় প্রয়োজনের একমাত্র সমাধান হলো: বিশ্বনবী হযরত রসুল করীম (সাঃ)। সুতরাং আমাদের এই যুগের জন্য যিনি প্রতিশ্রুত মহামানব তিনি নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী হবেন। খৃষ্টান,, ইহুদী, পার্শী, বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী, হিন্দু, প্রভৃতি সকল ধর্মের লোকদেরকে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পতাকাতলে একত্রিভূত করার দায়িত্ব তাঁরই উম্মতের এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করার প্রতিশ্রুতি ছিল—সেই মহান প্রতিশ্রুতি আহ্‌মদীয়া জমাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)—এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

## তাঁর দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ ঃ

হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর উপরোক্ত দাবীর প্রেক্ষিতে এখন বিচার্য বিষয় হলো: এই দাবীর সত্যতা কিভাবে নিরুপিত হতে পারে, কি কি শর্ত এবং যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাঁর দাবী কতখানি সত্য অথবা মিথ্যা তা যাচাই করা যেতে পারে?

সামনে আমরা এই বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করবো। আপাততঃ কতক গুলো বিষয় আমরা সহজেই উল্লেখ করতে পারি : (১) তাঁর দাবী কি এমন এক সময়ে এসেছে যখন সময়ের তীব্র প্রয়োজনীয়তা এমনই একটি দাবীকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে? যদি কালের প্রয়োজনীয়তার এই সাক্ষ্য সঠিক হয় তা'হলে তাঁর দাবীর যথার্থতা অনস্বীকার্য। আর যদি তা সঠিক না হয় তা'হলে তাঁর দাবীর কোন মূল্য নেই। আধ্যাত্মিক জগতে যখন কোন অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয় তখন তার দ্বারা সাধারণতঃ উহার পূর্ণ হওয়ার সময়ের আগমনও প্রমাণিত হয়। যখন মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে তৃষ্ণার্ত হয় তখন মানুষের এই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আধ্যাত্মিক বারিবর্ষণও বিলম্বিত থাকে না।

(২) এ কথাও সত্য যে, এ ধরনের দাবী একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে করা হয় না। প্রাচীন কালের ভবিষ্যদ্বানীসমূহে উহার ইঙ্গিত থাকে এবং বহু মানুষ কম-বেশী এইরূপ দাবীকারকের প্রতীক্ষা করে থাকেন। প্রাচীন লিপি এবং গ্রন্থাবলীতে এই দাবীর সমর্থনে বহু নিদর্শন নিহিত থাকে এবং সেগুলোর আলোকে অনেকেই বলতে পারে, প্রতিশ্রুত মহামানবের আগমনের সময় সত্যসত্যই এসেছে কি না।

(৩) কিন্তু সময়ের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য নিদর্শন যদি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তথাপি কি এইরূপ দাবী সম্পূর্ণরূপে সঠিক? না, সত্য দাবীকারকের জন্য আরো সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আমাদের দেখতে হবে যে, দাবীকারকের ব্যক্তি-জীবনের পবিত্রতা এবং তাঁর চরিত্র তাঁর দাবীর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। তিনি কি সেই সকল কাজ করতে পেরেছেন অথবা তা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন যা তাঁর দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল? হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বানী কি পূর্ণ হয়েছে অথবা অদূর ভবিষ্যতে সেই আসন্ন মহা-বিজয়ের সন্দেহাতীত নিদর্শনাবলী কি প্রকাশিত হয়েছে? তাঁর দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য আমরা এই সব বিষয় ভালভাবে বিচার করে দেখবো।

(৪) কোন ধর্মীয় দাবীর সমর্থনে অসংখ্য ঐশী সাহায্যের প্রমাণ থাকা প্রয়োজন এবং দাবী-কারকের সাহায্যার্থে ফেরেস্তাদের অংশগ্রহণের প্রমাণ থাকতে হবে।

(৫) কোন ধর্মীয় দাবীকারককে এমন অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী হওয়া প্রয়োজন যা বিশেষ ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে ছাড়া অন্যভাবে লাভ করা সম্ভব নয়।

(৬) সেই দাবীকারককে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ হতে জ্ঞাত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে হবে—যেগুলো যথাসময়ে পূর্ণ হওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, তাঁর সংগে জীবন্ত খোদার সম্পর্ক রয়েছে।

(৭) সেই দাবীকারকে—যিনি ইসলামের পুনর্জীবন দানের জন্য আবির্ভূত—আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা, পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন প্রদর্শন করতে হবে।

(৮) পরিশেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, এই ধরণের দাবীকারক ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও পুনঃ-প্রচার কল্পে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তা কি শুধু তাঁর জীবদ্দশাতেই সীমাবদ্ধ? আমাদের দেখতে হবে—তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীগণ তাঁর আরব্ধ কাজ এবং প্রোগ্রামসহ কিভাবে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে—যতদিন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামের কাঙ্খিত আধ্যাত্মিক বিজয় বাস্তবায়িত না হয়। সেই অনুসারীদের মধ্যেও তাঁদের প্রতিষ্ঠাতার মহা-কল্যাণের ধারা প্রবাহমান থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই সকল বিষয়ের প্রেক্ষিতে এখন আমরা বিচার করে দেখতে চাই যে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে যে সকল নিদর্শন রয়েছে সেগুলো কি বলে এবং হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)এর-দাবী কতখানি সত্য। আমরা আরো লক্ষ্য করবো যে, এই সকল বিষয়ের পর্যালোচনা দ্বারা তাঁর দাবী সত্য অথবা মিথ্যা রূপে প্রমাণিত হয়। একথা সত্য যে, সন্দেহ থেকে যেতে পারে—কিন্তু সেই সন্দেহগুলোকে মৌলিকভাবে উপরোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি সত্য বলে প্রমাণিত হলে সন্দেহ পরিত্যাগ করতে হবে। যদি হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) সত্যসত্যই প্রতিশ্রুত ইসলাম-পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী হয়ে থাকেন তা'হলে তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা এমন ব্যক্তিকে কখনই মনোনীত করেন না যিনি অন্যান্য মানুষকে বিপথে পরিচালিত করেন—খোদার দাস হওয়ার পরিবর্তে যিনি তার নিজের দাস হওয়ার জন্য লোকদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: "*মা কানা লেবাশারেন আঁই ইউতিয়াহুল্লাহুল কেতাবা ওয়াল হুকমা ওয়ান্নবুওয়াতা ছুম্মা ইয়াকুলা লিন্‌নাসে কুনু এবাদাল্‌-লী মিন দুনেল্লাহে*"।
অর্থঃ—কোন মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব নয় যে, আল্লাহতা'লা তাহাকে কেতাব, হুকুমত এবং নবুয়ত দান করেন এবং তিনি তখন মানুষকে বলেন: 'আমার দাস হও—আল্লাহর দাস হইও না।' (সুরা ইমরান: ৮০)

বস্তুতঃ আল্লাহর মনোনীত সকল ব্যক্তির জন্য একথা প্রযোজ্য। আল্লাহতা'লা এমন কাউকেও মনোনীত করেন না যিনি লোকদেক আল্লাহতা'লার পথ ছাড়া অন্য কোন পথে পরিচালিত করেন।

এখন আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করবো। (ক্রমশঃ)

[*"দাওয়াতুল আমীর" শীর্ষক গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ* Invitation-*এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ।*]

# জিন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অপোনোদন

—খন্দকার আজমল হক

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

(৩) মানব জাতীর প্রাথমিক যুগে মানুষ গুহায় বাস করিত। ইহারা উশৃঙ্খল ও হিংস্র ছিল। এক গোত্রের সহিত অন্য গোত্রের সর্বদা বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়া থাকার কারণে একে অন্যের নিকট হইতে নিজদিগকে লুক্কায়িত রাখিত। এই জন্য পুরাকালের গুহাবাসী মানুষদেরকেও জিন বলা হয়। অবশ্য গুহায় বসবাস করাও ইহাদিগের জিন আখ্যালাভের অন্যতম কারণ। এদের কথাই সুরা বাকারায় ৩০ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত আয়াত পাঠে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পূর্বে মানুষের ন্যায়ই শরীর ধারী জীব এই দুনিয়ায় বাস করিত। অত্র আয়াতে বলা হইয়াছে—

"আর যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি দুনিয়াতে একজন খলিফা পাঠাইব; তাহারা বলিল 'তুমি কি তথায় এমন জীব বানাইবে, যাহারা সেখানে শান্তিভবঙ্গ ও খুন-খারাবি করিবে. অথচ আমরা ত তোমার গুণগান করিতেছি এবং তোমার মহিমা ঘোষণা করিতেছি।' তিনি বলিলেন; নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জাননা।" (বাকারা : ৩০) খলিফার শব্দদ্বারা ফেরেশতাগণ মনে করিয়াছিলেন গুহাবাসী মানুষদের ন্যায় কোন নূতন জীবের সৃষ্টি আল্লাহ করিতে চাহিতেছেন যে তাহাদের উপর হাকিম হইবে। তাই তাহারা আপত্তি তুলিয়াছিলেন, ইহারা হয়ত ঐ সময়ের মানুষের ন্যায় খুন-খারাবি করিবে, তাহাদের ভুল অনুধাবন করাকে আল্লাহ বলিয়াছিলেন 'আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জাননা। হযরত আদম আঃ-কে খলিফা বলিয়া সম্বোধন করাতেও প্রতিয়মান হয়, তৎকালে হযরত আদম আঃ-এর ন্যায়ই জীব এই জগতে বাস করিত যাহাদের ভিতর তাঁহাকে খোদার প্রতিনিধিত্ব করিতে পাঠান হইয়াছিল। 'এমন এক জীবের সৃষ্টি করিবে, যাহারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি ও খুনখারাবি করিবে'— ফেরেশতাদের এই কথা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে, সেই সময় মানুষের ন্যায় এমন এক শরীরধারী জীব বাস করিত যাহারা খুব উচ্ছৃল ছিল। ইবলিস এই উচ্ছৃল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় একজন ছিল বলিয়াই আল্লাহ্ তাহাকে কোরআন পাকে জিন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার উগ্র স্বভাবের জন্য তাহাকে আগুনের তৈরী বলা হইয়াছে। (কাহাফ-৫০) এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

বিভিন্ন অর্থে কোরআনের যে সকল স্থানে জিন শব্দের ব্যবহার আসিয়াছে উহা আলোচনান্তে দেখা গেল, প্রতি স্থানেই আল্লাহ্পাক জিন শব্দ দ্বারা মানুষকেই বুঝাইয়াছেন এবং ইহাও প্রমাণিত হইল, জিন শব্দের যে অর্থ সাধারণভাবে প্রচলিত আছে পবিত্র কোরআন-পাকে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই।

এখন কিংবদান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক, যাহা জিন সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। প্রচলিত কিংবদন্তি সমূহ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, কোন অশরীরী

জীবের প্ররোচনায় নয় বরং কোন অসুস্থতার কারণেই কেহ কেহ বিকারগ্রস্থ হইয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত আচরণ করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে যাহারা তথাকথিত জিন-ভূত ছাড়ানোর দাবী করেন, তাহাদের কির্ত্তি কারখানা বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। হিপনোটিজম সম্বন্ধ যাহাদের জ্ঞান আছে তাহারা জানেন, ইহা দ্বারা মানুষের অবচেতক মনের মাধ্যমে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করা যায়। এমন অনেক কথা প্রকাশ করা যায় যাহা তাহাদের জানার কথা নয়। ওঝাগণ হিপনোটিজমের দ্বারা এরূপ কথা বলানোর ফলে জিন সম্বন্ধে অনেকে কোরআন হাদিসের বিপরিত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। হিজমোটিজম-এর প্রভাবযুক্ত লোকের দ্বারা জিন সম্বন্ধ অনেক অবাস্তব কথা প্রচার করাও এরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য দায়ী। কোন কোন ক্ষেত্রে পীর সাহেবের কামালিয়ত জাহির করার জন্য পীর সাহেব বা তাঁর সাগরেদগণ জিনকে পীরের মুরিদ বা পীরের পিছনে নামাজ পড়ার কথা প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ জিনের দর্শন লাভ করিয়াছেন এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। এই সকল কিংবদন্তির উপর নির্ভর করিয়া জিনের অস্তিত্ব স্বীকার করা নিছক নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

একটি বিষয় এখনও অপরিস্কার রহিয়া গিয়াছে। কোরআন পাকে আল্লাহ জিনকে আগুন ও এনসানকে মাটি দ্বারা সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। জিন ও এনসান যখন মানব জাতিরই দুইটি অংশ তখন এরূপ বলার তৎপর্য কি? বস্তুত জিন ও এনসানকে আগুন ও মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার কথা বলায় শব্দদ্বয়ের অর্থ আরও পরিস্কার হইয়াছে। আগুনের স্বভাব উর্দ্ধগামি ও দাহ্য বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে প্রজ্জলিত করা। মাটির স্বভাব সবকিছু নিরবে সহ্য করা। প্রভূত্বকারী বা নেতৃস্থানীয় মানব সম্প্রদায় তাহাদের স্বভাবিক ব্যাক্তিত্ব দ্বারা সহজেই সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে বসিভূত করিয়া রাখে। অগ্নির লেলিহান শিখার ন্যায় তাহার ইচ্ছাকে কার্যকরি করার জন্য সে বদ্ধপরিকর থাকে। অনুগামীদের ভিতর তাহার কার্যের কৈফিয়ত লওয়া বা বাধা দেওয়ার কেহ থাকে না। যদি এরূপ কোন বাধা আসে তবে অগ্নির জলন্ত শিখার ন্যায় তাহা নির্মূল করিতে যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে; যার ফলে প্রভূত্বকারী শাসক সম্প্রদায়ের ইচ্ছার নিকট সাধারণ মানুষদিগকে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। প্রভূত্বকারীদের যথেচ্ছ অত্যাচার তাহারা নিরবে সহ্য করে। অগ্নিস্বভাব বিশিষ্ট হওয়ার কারণে যথেচ্ছাচারী শাসকগণকে অগ্নিপুরুষ ও মাটির স্বাভাব বিশিষ্ট মানুষকে 'মাটির মানুষ' বলা হইয়া থাকে। এই জন্যই আল্লাহপাক অগ্নি শিখার ন্যায় বেপেরায়া ও প্রভাব বিস্তারকারী জিন বা এনসান সম্প্রদায়কে আগুনের তৈরী ও মাটির ন্যায় নিরিহ সাধারণ মানুষকে মাটির তৈরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষ্যনীয়, প্রভূত্বকারী ও অনুগত মানব সম্প্রাদায় বুঝাইতে আল্লাহপাক যে সকল স্থানে

জিন ও এনসান শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ইহাদের প্রতি স্থানেই জিনকে আগুনের ও এনসানকে মাটির তৈরী বলিয়াছেন। অন্য কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। আবার যে সকল স্থানে জিন ও এনসানকে আগুন ও মাটির তৈরীর কথা বলা হইয়াছে ইহাদের অধিকাংশ আয়াতই ইবলিসের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত। ইবলিসের তার সম্প্রদায়ের নেত্রী স্থানীয় ছিল। তাহার ইচ্ছা শক্তি ছিল অগ্নি শিখার ন্যায় উর্দ্ধগামি। নেতৃস্থানীয় হওয়ার কারণে প্রভুত্বর অহমিকায় সাধারণ মানুষ হযরত আদম আঃ-এর আনুগত্য শিকার করিতে অহমিকায় আঘাত লাগে যারফলে আল্লাহ্‌র নির্দ্দেশকে অমান্য করিতেও সে দ্বিধা করে নাই এই কারণেই তাহাকে আগুনের তৈরী বলা হইয়াছে।

যে সকল স্থানে পৃথকভাবে (ইবলিসের উল্লেখ বিহীন) এনসানকে মাটি ও জিনকে আগুনের তৈরী বলিযাছেন তাহার ভিতর সুরা আর রহমানের আয়াত ( ১৪-১৫ ) উল্লেখযোগ্য। এখানে আল্লাহ্ বলিয়াছেন "আমি এনসানকে ঠনঠনে মাটি ও জিনকে শিখাযুক্ত অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি।" 'ঠনঠনে মাটি' ও 'শিখাযুক্ত অগ্নি' তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু মাটি বা আগুন না বলিয়া ঠনঠনে মাটি বা শিখাযুক্ত অগ্নি বলায় স্পষ্টই প্রতিয়মান হইতেছে, আল্লাহ্ মানুষ ও জিনকে মাটি ও আগুনের স্বভাবিক ধর্ম বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে সৃষ্ট জিন ও এনসানের কথাই পরবর্তি কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ৩১-৩৩, ৩৯-৩১ আয়াতের "ইয়া আইওহাস সাকালান"—হে পরস্পর নির্ভরশীল দল, সুরা আন আমের আয়াত ১২৯ এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে পরস্পর নির্ভরশীল দলদ্বয়কে জিন ও এন-সান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তি ৩৩ ও ৩৯ আয়াতদ্বয়েও এই পরস্পর নির্ভরশীল দলকে জিন ও এনসান বলা হইয়াছে। এবং এই নির্ভরশীল দলদ্বয় মানবজাতিরই দুই অংশ, তাহা সুরা আনয়ামের আয়াত ১২৯-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

আরও লক্ষ্যণীয়, কোরআনের যে সকল স্থানে সাধারণ অর্থে মানব সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে তাহার কোন কোন স্থানে পানি (ماء) কোথাও 'বীর্য বা মাটির সারবস্তু' শব্দ আসিয়াছে, আবার কোন কোন স্থানে শুধু মাটির তৈরী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে ( দেখুন আম্বিয়া ৩০, ফোরকান ৫৪ নহল-৪ মুমেনুন ১২-১৩. আনয়াম-৪, সেজদা—৭, ৮, ) ইহাদের মধ্যে সুরা মুমেনুনের ১২-১৩ ও উহার পরবর্তী আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির প্রকৃত তথ্য উদ্ভাসিত হইয়াছে। ১২ আয়াতে বলা হইয়াছে 'মানুষকে মাটির সারবস্তু হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।' পরবর্তী আয়াতে এই সার বস্তুকে বীর্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুত বীর্য যে মাটির সারবস্তু হইতে সৃষ্টি ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মানুষের রক্ত হইতে বীর্যের সৃষ্ট এবং রক্ত খাদ্যের সারবস্তু হইতে সৃষ্ট। যে কোন খাদ্যই বৃক্ষ-লতা বা ফসলাদি হইতে আসে এবং এই সমস্ত বৃক্ষ-লতা ও ফসলাদি মাটির সারবস্তু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। মানুষ যে মাছ মাংস খাইয়া থাকে তাহা যে সকল মৎস পশুপাখী হইতে পাওয়া যায় তাহারাও তৃনলতা খাইয়া নিজেদের দেহকে পুষ্ট

করে। এই সকল তৃণলতা মাটির সার হইতেই সৃষ্ট। দেখা যাইতেছে, যে রক্ত হইতে বীর্যের সৃষ্টি, প্রকারান্তরে ইহা মাটির সারবস্তু হইতেই আসিয়াছে। আবার বীর্যও এক প্রকার পানি। সুতরাং বীর্য পানি বা মাটির সারবস্তু বলিতে প্রকৃত পক্ষে বীর্যকেই বুঝাইতেছে। তাই আল্লাহ্পাক বলিতেছেন "মানুষকে মাটির সারবস্তু হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে, অতঃপর ইহা জরায়ু গব্বরে বীর্যরূপে স্থাপিত হইয়াছে।' ("মুমেনুন-১২-১৩) সুরা আন-আম ও সেজদায় এই অর্থেই মানুষকে মাটির তৈরী বলা হইয়াছে। আল্লাহ্র কালামে কোন পরস্পর বিরোধী কথা নাই। একস্থানে মাটির তৈরী, অন্যস্থানে পানি বা বীর্যের তৈরী নিশ্চয়ই পরস্পর বিরোধী। কিন্তু মাটি বলিতে মাটির সারবস্তু, যাহা আল্লাহ্পাক নিজেই বলিয়াছেন, ধরাতে আর কোন বিরোধ থাকে না। ইহাতে বিভিন্ন আয়াতের অর্থের সামঞ্জস্যও বজায় থাকে। এবং এই অর্থ জীব বিজ্ঞানের সহিতও সঙ্গতি সম্পন্ন।

আশাকরি পাঠকবর্গ মানুষ মাটির তৈরী কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

পরিশেষে কোরআনের একটি উদ্ধৃতি দিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। যেখানে জিন ও এনসানের অর্থ আরও পরিষ্কার হইয়াছে। "এবং তাহারা এক সঙ্গে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তখন দুর্বল লোকগণ অহঙ্কারী লোকদিগকে বলিবে 'আমরা তো তোমাদের অনুগত ছিলাম, এখন কি তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে?" (ইব্রাহিম—২১) আবার সুরা আনয়ামের ১২৯ আয়াতে যাহাদের একত্রে জমা করা হইবে তাহাদিগকে জিন ও এনসান বলা হইয়াছে এবং সেখানেও এনসানদিগকে জিনদের অনুগামি বলা হইয়াছে। এই দুইটি আয়াত একত্রে পাঠ করিলেই পাঠকগণ সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন, আল্লাহ্পাক প্রভাববিস্তারকারী বা অহংকারী দলকে জিন ও দুর্বল বা অনুগত দলকে এনসান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুরা আহযাবের ৬৭ আয়াতেও একই প্রকার উক্তি করা হইয়াছে।

কোরআনের এরূপ স্পষ্ট আয়াতসমূহ থাকিতে যাহারা জিন ও এনসানকে দুইটি পৃথক জীব বলিয়া থাকেন তাহারা যে আল্লাহ্র কালামের বিপরিত কথা বলেন নিশ্চয়ই পাঠকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

জিন ও এনসান সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল, তদ্বারা যাহারা জিনকে অশরীরী পৃথক জীব বলিয়া বিশ্বাস করেন, আশা করি তাহাদের সে বিশ্বাস দুরিভূত হইবে এবং কোরআনের শিক্ষানুযায়ী নিজেদের বিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিবেন। কোরআনের প্রকৃত অর্থ না বোঝার জন্য মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং নানা প্রকার কুসংস্কার ও বেদাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে। তাই কোরআনের প্রকৃত অর্থ জনসমক্ষে প্রকাশ করা ও সকল কুসংস্কার ও বেদাত দূর করার জন্য যুগে যুগে যুগ-ইমামগনকে আল্লাহ্পাক প্রেরণ করিয়া থাকেন। বর্তমান শতাব্দির যুগ-ইমাম জিন ও এনসানের প্রকৃত অর্থ প্রকাশের ন্যায় কোরআনের অনেক ভুল ব্যাখ্যা দুরিভুত করিয়াছেন ও কোরআনের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্র তরফ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধ যুগ-ইমাম এবং তাঁহার খলিফাগণের লেখা হইতে জ্ঞান লাভের ফলেই লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ্ সকলকে তৌফিক দিন যেন তাহারা যুগ-ইমামকে চেনার সুযোগ লাভ করিয়া কোরআনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন ও নিজদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের পথে পরিচালিত করেন। — আমিন

# কাদিয়ান ও নিখিল ভারত জামাত আহ্‌মদীয়ার আমীর হযরত মৌলানা আবদুর রহমান সাহেব ইন্তেকাল করিয়াছেন।

—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'—

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই মর্মান্তিক সংবাদ জানান যাইতেছে যে, কাদিয়ান ও নিখিল ভারত জামাত আহ্‌মদীয়ার আমীর ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর সাহাবী হযরত মৌলানা আবদুর রহমান সাহেব ১৮ই ও ১৯শে জানুয়ারী ১৯৭৭-এর মধ্যবর্তী রাত্রে হৃদ রোগের তীব্র আক্রমণে প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে কাদিয়ানে এন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

২১শে জানুয়ারী, রাবওয়ায় জুমার খোৎবার শেষে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) হযরত মৌলভী সাহেবের ওফাতের কথা উল্লেখ করিয়া বন্ধুগণকে এই দোয়া করিতে তহ্‌রীক করেন যে, হযরত মৌলভী সাহেব যে সকল কুরবানী ও খেদমতের তওফিক পাইয়াছেন আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাহা কবুল করেন এবং উচ্চ দারাজাত তাঁহাকে দান করেন। হুজুর জুমার নামাযের পর তাঁহার 'নামায জানাযা গায়েব' পড়ান, যাহাতে কয়েক হাজার উপস্থিত মুসল্লী যোগদান করেন।

হযরত মৌলভী সাহেবের সারা জীবনই ইসলামের অতি মূলাবান খেদমতে অতিবাহিত হয়। উপমহাদেশ বিভাগ কালে অতি দুর্যোগপূর্ণ যুগে এবং উহার পরবর্তী ২৭ বৎসর কাল ক্রমাগত কাদিয়ান ও নিখিল ভারত জামাত আহ্‌মদীয়ার আমীর এবং সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার নাযেরে আলা হিসাবে তিনি যে সকল গুরুত্বপূর্ণ মহান খেদমত সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন সে জন্য তাঁহার নাম সেলসেলা আলিয়া আহ্‌মদীয়ার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি দেশ বিভাগের পূর্বে ও পরে কাদিয়ানের মিউনিসিপেল কমিটির মেম্বার এবং প্রেসিডেন্টও ছিলেন।

আমরা হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ), হযরত মির্যা ওয়াসিম আহ্‌মদ, নাযের, দাওয়াত তবলীগ (কাদিয়ান) ও কাদিয়ানের সকল দরবেশানে কেরাম এবং হযরত মৌলভী সাহেবের শোক সন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আমাদের এই বিনীত দোওয়া, তিনি যেন হযরত মৌলভী সাহেবকে জন্নতুল ফেরদাউসে উচ্চ দারাজাত দান করেন এবং 'আলা ইল্লিঈনে' স্থান দান করেন। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা ও ধৈর্য ধারণ করিবার তওফিক দেন এবং তাঁহাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হন। আমীন।

# ওকফে জদীদের ২০তম বর্ষের সূচনা

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ৭ই জানুয়ারী (মোতাবেক ৭ই সুলাহ্ ১৩৫৬ হিঃ শামসী) ওকফে-জদীদের ২০তম বর্ষের ঘোষণা করেন এবং জামাতকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে 'মালী ও জানী কুরবানীর" ময়দানে আগুয়ান ও অগ্রসর হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। হুজুরের উক্ত খোৎবা শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া জামাতের বন্ধুগণের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। আপাততঃ নব বর্ষের মোবারকবাদ পেশ করিয়া আমরা তাঁহাদের নিকট নিম্নরূপ অনুরোধ জানাইতেছি:—

(১) শীঘ্র নিজেদের ওকফে জদীদের নববর্ষের ওয়াদা সামর্থানুযায়ী পূর্বাপেক্ষা অনেক বর্ধিত পরিমাণে নিজ নিজ জামাতের সেক্রেটারী ওকফে জদীদের মাধ্যমে পেশ করুন।

(২) ওকফে জদীদের সেক্রেটারী সাহেবান জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সম্পূর্ণ ওয়াদার তালিকা প্রস্তুত করিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিসে যথাশীঘ্র পাঠাইয়া দিন।

(৩) বাচ্চাদের (তথা আতফাল, নাসেরাত ও অল্প বয়স্ক শিশুদের) ওয়াদার তালিকা পৃথকভাবে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে।

(সেক্রেটারী ওকফে-জদীদ, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া)

## শুভ বিবাহ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১৪ই জানুয়ারী তারিখে কাছাইট (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী জনাব আবুল ফজল মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের প্রথমা কন্যা মোঁসাম্মৎ ফাতেমা বেগম-এর সহিত তারুয়া নিবাসী জনাব সফিউদ্দিন আহমদ (দারু মিঞা)-এর পুত্র জহির আহামদ-এর শুভ বিবাহ ৪০০০ (চারি হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ মসজিদ মোবারকে সুসম্পন্ন হয়।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীনরূপে বাবরকত হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

আহমদী

# হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্টকান জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত; বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে;

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

31st January 1977 THE AHMADI Regd. No. DA—12

# আহ্মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ ( আ: ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামূল আম্বিয়া ( নবীগণের মোহর )। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী ( আলাইহেমুস সালাম ) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমুহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।"

( আইয়ামুস সুলেহ্, পৃ: ৮৬-৮৭ )

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar*